ধান্যচরিত

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

আমাদের গ্রামের উত্তরে, মানসার জলায় আমাদের যে একবিঘে জমি আছে, ততে যা ধান চাষ হয় আমাদের সম্বৎসরে খোরাকি খুব হেসে-খেলে চলে যায়। বাকি জমিতে সিজিন অনুযায়ী ফসল করি। তাতে সবজি-বাজারের জিনিস মাস-ছয় কিনতে হয় না। পাড়ায় অমলেন্দুর দোকান থেকে নুন-তেল-মশলা কিনলেই জীবনযাত্রা নির্বাহ হল।

কিন্তু খোরাকি এই ধান নিয়েই গত একমাস ধরে বাড়ির সবাই খুব সমস্যায় পড়েছে। ভালো জাতের মিনিকেট চাষ করি আমরা। বাজারে এই মুহূর্তে সেটার দাম চলছে পঁচিশ থেকে আঠাশ টাকা কেজি। এই ভাতে কারও অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু ঘটনা হল এই চালের ভাতে ঠাকুমা মড়া পোড়ানোর গন্ধ পাচ্ছে।

ঠাকুমা বলে, ছিঃ, মড়ার ধোঁয়ার গন্ধ-মাখা ভাত কেউ খেতে পারে? ও জমি তুই বেচে দে খোকা। শ্মশান ধারের জমির দরকার নেই আমার। ওটা বেচে ওর পয়সায় অন্য মাঠে ভালো জায়গায় ধানজমি কেন।

প্রথম প্রথম ঠাকুমার এই বাতিক নিয়ে বাড়ির সবাই খুব বুঝিয়েছিল। একান্নবর্তী সংসার আমাদের। মোট মেম্বার চোদ্দ জন। কিন্তু ঠাকুমা কারও কথা কানে তোলেনি। উর্বর জমি। পাশের খাল থেকে পাঁক তুলে জমিতে দেওয়া হয়। বছরে দু'বার ধান হয় এমন জমি বেচে কেউ?

ঠাকুমা আপন মনে বলে, তোরা কেউ আমার ভোলাতে পারবিনি রে! ওই ভাত মুখে দেওয়া মানে মড়ার ছাই খাওয়া।

শুনে বাড়ির সকলে ছি ছি করে ওঠে। বাবা বলে, এ তুমি কী বলছ মা? আমরা সকলে মড়ার ছাই খাই? এমন কথা মুখে আনতে পারলে?

—তোদের কথা কে বলেছে? আমি মরচি আমার জ্বালায়! ও ভাত আমি মোটেই মুখে তুলবুনি— এই আমার শেষ কতা। তাতে তোরা আমায় রাকতে পারবে রাকবি, নইলে ফেলবি। সেটা তোদের ব্যাপার।

অশান্তি এমনিভাবেই শুরু হয়। পাড়ার সকলে বলে, বয়স হয়েছে তো, মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে বামুনদিদির। মনসার জলায় আমাদের সকলেরই তো অল্পবিস্তার জমি রইছে, কই আমরা তো পাই না।

মনসার জলাটা আমাদের গ্রামের দখিন পাড়ায়। পাড়াটার শেষ বাসিন্দা কাঁড়ারার কয়ঘর। তারপর বিরাট এক বাঁশবন। পুকুর। সরু এক পায়েচলা পথ বাঁশবন ও পুকুরের মাঝ দিয়ে গেছে। খানিক গেলেই একটা নালা। খালের বাড়তি জল বা বর্ষার জন্য সেই নালাতে জমা থাকে চাষের সুবিধার জন্য। এই নালার পরই মনসার জলার শুরু। আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। ধানই প্রধান ফলস। এ ছাড়া কুমড়ো, শশা, পটল চাষও করে অনেক চাষি। জলার ওপারে গণেশপুর গ্রাম।

শ্মশানটা এই জলার বাঁপাশে। খালপাড়ে। অনেকটা জমি নিয়ে এই শ্মশান। শ্মশানকালীর পাকা মন্দির, কাঁঠাল, আম, কদম, জবা, কলকে প্রভৃতি গাছ। একটা টিউকল। চাষিরা এখান থেকে পানীয় জল নেয়। আমাদের জমিটা শ্মশানের পায়ে চলা রাস্তাটার গায়েই।

উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছি। বেকার বসে থাকব কেন, তাই আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে 'মশাট যুব কম্প্যুটার সেন্টার'-এ ভর্তি হয়ে গেছি তিন মাসের কোর্সে। অন্তত বেসিকটা জানা রইল।

ঘরের কাজ আর কম্প্যুটার শেখা বাদ দিয়ে আমরা দিনের মধ্যে অনেকটা সময় এই শ্মশানেই আড্ডা মারি। কালী মা-র চাতালে গামছা পেতে বা মৃত মানুষের উৎসর্গ করা বেদিতে আমরা বসি। বিড়ি টানি। কে কোন্ কলেজে পড়বে, কলকাতায় কোন্ কলেজে বেশি বেশি সুন্দরী মেয়েরা ভর্তি হয়, তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করি। এদেরকে আমি আমার ঘরের বর্তমান সমস্যার কথা বলি।

জহর বলল, —এটা তো ঠিকই, মড়ার ছাই এইসব ধান জমিতে পড়ে। ধানের থোড়, দুধ চাপা পড়ে যায় মানুষ পোড়ার গন্ধে। তোর ঠাকুমার কথা শুনে মনে হয়, শ্মশানের শ'এর উলটো দিকে ধান জমি কেন, কোনো চাষই হওয়া উচিত নয়। আমাদেরহ গ্রামের শ্মশানটা দেখেছিস কেমন জঙ্গলের ধারে? ওটিই বেস্ট। এসব কথা ভেবে যদি তোর ঠাকুমা এতটা বয়সে এসে ওই চালের ভাত খেতে অস্বীকার করে দোষ দেওয়া যায় কি?

বললাম, —দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু রোজ রোজ একথা বললে আমাদেরও কি ঘেন্না লাগে না বল?

—তা ঠিক।

—বাড়িতে নতুন করে কিছু ভাবছে না?

—কী ভাববে? সবাই বিরক্ত হয়ে উঠেছে। চাল রোজ কিনে আনতে হবে ঠাকুমার জন্য। আগে থেকে এনে জমিয়ে রাখলে হবে না। ঘরে রাখলেই ঠাকুমা বলবে, মড়াইয়ের ধান।

—সমস্যা বটে!

—আমার কী মনে হয় জানিস জহর, এর পেছনে অন্য কোনো রসায়ন আছে।

—কী রসায়ন?

—ঠাকুমা অতীত দিনের সঙ্গে আজকের দিনকে এক করে দেখছে।

—খুলে বল।

—তুই পৃথুরাজার গল্প জানিস?

—কৃষির দেবতা পৃথু?

—হ্যাঁ। পৌরাণিক গল্প। ঠাকুমার হয় কী, মধ্যে মধ্যে আমায় সেই পৃথুরাজার গল্প বলে। পৃথুই সর্বপ্রথম ধান আবিষ্কার করেন। তার আগে

পৃথিবীর মানুষ যব খেত। এক হাজার প্রজাতির ধান আবিষ্কার করেন তিনি। তার মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রজাতির ধানকে চাষযোগ্য করে তোলেন।

—হুঁ। ডিটেলে জানতুম না। এই জানলুম।

—আমি তারপর কিছু বইপত্র পড়ছি জানিস। দেশি ধান নিয়ে লেখা। এখনকার এইসব হাইব্রিড উচ্চফলনশীন নয়, কম ফলেনের দেশি প্রজাতির ধান। সেই প্রজাতি, যা পৃথুরাজা আবিষ্কার করেন ও মানুষ বংশ পরম্পরায় বহন করেছে।

—নেশা লেগে যাচ্ছে। কত কিছু জানি না। তারপর?

—ঠাকুমা আমাকে ধানের গল্প শোনায়। লক্ষণশাল, ভাঙামানিক, রঘুসাল, শ্যামা, মুখতমুখি, দাদখনি—কত কিছু ঠাকুমা চাষ নিয়ে জানে যে ভাবলে আশ্চর্য লাগে। বাবা, কাকা কি আমিও তো মাঝে মধ্যে মাঠে নামি, জানিই না। তখনকার চাল নাকি খুবই স্বাদু। ধান থেকেই মিষ্টি গন্ধ উঠত। ঘর ম ম করত ধানের গন্ধে।

—তারপর?

—তারপর ঠাকুমা আমায় কালকে ডেকে বললে, এমন ভাত কারা ফোটায় জানিস?

—বললুম, না।

—কারা রাঁধে, কারা খায়?

—জানি না ঠাকুমা।

—আমার বাপের বাড়ির দেশ, ওখানেও নেই? কতদিন যে বাপের ভিটেয় পা দিইনি। ওরা কি সব মরে হেজে গেল? খোঁজখবরও করা হয় না।

শেষের দিকে হতাশ লাগে ঠাকুমার গলা। চুপ করে পাশে বসে থাকি। মাটির রাস্তা দিয়ে মানুষ যায়। সাইকেল যায়। একটা লাল কুকুর ইতি-উতি তাকাতে তাকাতে হাঁটে। আমি আকাশ দেখার ছলে উঁচু করে তাকাই। যদি জমি দেখা যায়। আমাদের ধান জমি।

আমাদের অর্থনীতি চাষ। চাষ করে দু'তিন পুরুষ দিব্যি চলছে। ফসল বেচে যা পয়সা আসে তা দিয়ে সংসারের খরচ মেটে। বলা যায় সর্বমোট চার বিঘের জমির অধিকারী আমরা। ডাঙা জমিতে এখন পাটদানা ছড়ানো হয়েছে। বিঘে খানেক জমি আছে এক ফসলি। বাকি সব দোফলা।

আমিও টুকটাক জমি দেখি। ধান কাটতে হয়, বা ইউরিয়া মারতে হয়। তবুও মনে হয়, শেষমেষ আমি চাষি হব না। চাকরি করব। আর শহরে গিয়ে যারা গ্রামকে ভুলে গেছে, তাদের মতো হব না।

জহর বলল, কী হল রে অর্ক? চুপ মেরে গেলি।

সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। খালের ওপারে বাঁশঝাড়ের ওপাশ দিয়ে। শেষ আলো কোনো ছায়া ফেলতে পারে না জলে। জলের অর্ধেক দখল করে আছে কচুরিপানার দাম।

বললাম, কোনো উপায় কি নেই?

—কী ব্যাপারে বলছিস বল তো?

—ওই ধানবীজ কারও কাছে পাওয় যাবে না?

—সুগন্ধি ধান? পেতে পারিস। জেলার কৃষি দপ্তরে যা কোনো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

—সে তো অনেক বড়ো ব্যাপার।

—আমাদের গ্রামের তিনকড়ি মাখালকে দেখেছিস তো। বুড়োরা বলে ওর বয়সের গাছপাথর নেই। একশো বছর বাঁচা হয়ে গেছে। ওর ভাঁড়ারে কিছু থাকলেও থাকতে পারে। হাইব্রিড চাষ করে করে এখনকার চাষিরা সব দেখি কিছু ভুলে মেরে দিয়েছে। সেই কোন পালযুগ থেকে বাঙালি চাষবাদ ও কুটির শিল্পমুখী হয়ে উঠেছে। এখন সবই বিদেশি ব্যাপার।

২

সারা মাঠ জুড়ে আধপাকা ধান হয়ে আছে। এক হাত সাইজ গাছ। ঠাস গোছ। দুটি বীজধান পুঁতলেই এখন এই মোটা গোছ হয়। চিটে নেই। ফাঁক নেই কিছুতে। প্রতিটি শিষেই সলিড দানা। মাটির নীচ থেকে উঠে আসা সাদা জলে চাষ হয়। গত আশ্বিনের পর, এখন চৈত্র; কোনো বৃষ্টি নেই। হু হু জল খায় আর গোছ বাড়ায় এই সব আই-আর ছত্রিশ। স্বর্ণ ধান।

ধান কাটা হবে বৈশাখের মাঝমাঝি। এখন গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। একটা ঝড় পর্যন্ত হল না। চাষিরা এসব চাইছে না। গরমে মরা যাবে তাও আচ্ছ, ঝড় জল নয়। তাহলেই সব কষ্ট-খরচ মাঠে মারা যাবে।

এক হপ্তা পর আমি জহরের বাড়ি গেলাম। জহর তার আগে খবর এনেছিল। জব্বর খবর। বুড়ো তিনকড়ি মাখালের বড়ো মাটির ঘরটায় মাঠগুদামের উপর বড়ো বড়ো তিনটি জালা আছে। তিনকড়ির বাবা এককড়ি সেই সব জালা ভরে রেখেছে পুরানো বীজ ধানে। সেগুলি তখন অত পুরানো ছিল না। কিন্তু লুপ্তপ্রায় হয়ে আসছিল। এককড়ি বুঝেছিল, এই ধান নষ্ট হয়ে যাবে। ভবিষ্যতের জন্য বীজ তোলা রাখল সে। তার প্রজন্ম নিশ্চয় চাষ করে বীজধান বাড়াবে। বুড়ো তিনকড়ি মাখাল যক্ষের মতো আগলে রেখেছে ওগুলি। নিজে বসায়নি। আর ওর ছেলেদেরও ওইসব পুরাতন ধানবীজ নিয়ে কোনো উৎসাহ নেই। ওর পিছনে খাটুনির বহর ওরা জানে। খবরটা জহর দিল বাঁধের উপর বসে। গাছ সব পেকে এসেছে প্রায়। মাটিতে জল নেই। দিন কয়েক পরই ধান কাটা শুরু হবে। তখন আমরা আড্ডা দিচ্ছি। জহর খবর আনল। উৎসাহিত হলাম। হাতে

একটা কিছু অস্ত্র এল। এবার যদি বাতিকটা বন্ধ হয় ঠাকুমার।

সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে ঠাকুমাকে বললাম, বাঘাটির তিনকড়িকে চেন?

চট করে ধরে নিল ঠাকুমা। স্মৃতি খুবই সরেস। বললে—কোন তিনকড়ি? মাখাল?

—চেন?

—বিলক্ষণ! তোর দাদুকে ঠাকুরমশাই বলত। মান্যি করত খুব।

—তবে তো হয়েই গেল!

—কী বল তো?

—বুড়োটার কাছে বহু পুরাতন বীজধান গচ্ছিত আছে।

—দেখবি তবে?

—দেবে তো?

—তোর দাদুর নাম করবি— দেবে। আর বলবি আমি চেয়েছি। ও বীজ আমি নিজের হাতে চাষ করব।

—জমিতে নয়, পেথম বছর উঠোনের কোণায় লাগাল। ঘর দেখবি কেমনি সর্বক্ষণ ম ম করে এমনি তার গন্ধ! পাতা অবধি সুগন্ধি। গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত, ঘি এট্টু, সঙ্গে পাট শাক ভাজা— এ খাবার মর্ম কি বুঝবি তোরা? সঙ্গে যদি চাট্টি মোরলা মাছ কলাপাতায় পড়ে তো হয়েই গেল! চাষ কত করেচি। তোর দাদুর সাথে যৌবন বয়সে মাঠে যেতুম। পাকা ধান, এই লম্বা গাছ, কী রূপ তার! প্রতি কোজাগরি পুন্নিমাতে রতে আর ফটফটে জোছনার সময় মা লক্ষ্মী স্বয়ং এসে নিজের কাঁখাল থেকে স্বর্ণকলসি নামিয়ে ধানগাছের গোড়ায় সোনার জল ঢালতেন কিনা।

আমি আশ্চর্য হয়ে মানুষের এই সরল বিশ্বাসের গল্প কাহিনি শুনি। প্রাচীন মানুষেরা কতকিছু রূপককে জীবনের অঙ্গ করে নেয়। সেই রূপকই তখন হয়ে ওঠে জীবনের শ্বাসবায়ু। প্রাণসখা। হয়তো তাই বেঁচে থাকাটা সহজ হয়ে ওঠে। আয়ু বেড়ে যায় মানুষের। অবলীলায় একশো বছর বাঁচতে পারে।

ঠাকুমা বলতো লাগল ধানের উপর মুখে মুখে প্রচারিত কয়েক লাইন ছড়া। এর নাম ধান্যচরিত। ছড়াটি ছিল এরকম!

হরগৌরী হইল ধান্য দেখিতে সুন্দর।
অর্ধঅঙ্গ ধবল অর্ধ লাল কলেবর।।
চিত্রশাল জটাশাল জগন্নাথ ভোগ।
জামাইনাড়ু জলারঙ্গি জীবনসংযোগ।।

বুঝি, এইগুলি সবই ধানের নাম। কত বিচিত্র ধান ছিল, সেই নাম দিয়ে কোন কবি রচনা করেছিলেন এই ধান্যচরিত। আজও তা মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

তারপর ঠাকুমা বললে, —বিদেশি ধান গিলে ফেলচে সব দিশি ধানকে। আর কয়টা দিনই-বা বাঁচব। তার ভেতর যদি ওই সুগন্ধি ধানের ভাত খেতে পারি তো পরন জুড়ায়। এখন কী যে সব ধান উঠেছে। বাইরের দুয়ারে বসে যখন ঝিমুনি আসে, বুঝলি নাতি, মনে হয় হরগৌরী ধানের গন্ধের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। তোর দাদু আমার হাতটা শক্ত করে ধরে আচে। ছটফটে বাই। যদি মাঠের জলে নেমে কাঁকড়া ধরে আনে— এই ভয়! হা হা।

—তখন হরগৌরী ধান ছিল?

—মনে নাই রে। কবেকার কথা সব। তবে, নামও মনে পড়ে না সব ধানের। ওই কিছু কিছু—

—জহরের গ্রামে কাল যাচ্ছি।

—যা। ধান নে আয়।

তারপর একটু চুপ করে থেকে ঠাকুমা বললে, আজ যদি পৃথুরাজা থাকত!

৩

ভাতে ঠাকুমা মড়ার গন্ধ পায় শুনে তিনকড়ি বুড়ো চুপ করে রইল। ভাবলাম, হয়তো ঠিকঠাক শুনতে পায়নি। দ্বিতীয়বার বলতেই বললে, —তোমার ঠাকুমার কথা? ওঁকে এখন যত্ন করো। এমন গন্ধ পাওয়া মানে আর বেশি দিন নয়।

একটু দমে গেলাম।

—ঠাকুমার শরীর কিন্তু ঠিক আছে।

—তবু। বয়স হচ্ছে তো। কখন কী হয় তার ঠিক কী। আমি তোমার ঠাকুমার চেয়ে বড়ো অনেক। কিন্তু এ হল মাদারীর খেল! এই আছি এই নেই।

—কিছুই কি করা যায় না?

—ভাবতে হবে! শ্মশানের জমি বাদ দিয়ে আরও জমিতে ধান চাষ হয় তো তোমাদের। সেখানের চাল?

—রাখা তো হচ্ছে একটাই মড়াইয়ে।

—সেটা একটা কথা বটে।

তিনকড়ি আমাদের ধানের গল্প বলে। সেও কোনো স্বাদ পায় না। কিন্তু খাবে কী সে। খেতেই হয় নইলে জীবধারণ হয় না। ভরপেট

খেয়েও মনে হয় পেটের এককোন খালি রয়ে গেল। আর আগের ধান? এক মাইল দূর থেকেও গন্ধ পাওয়া যেত। কী সব দিন ছিল তখন! কত ধান, কত তার নামের বাহার। চাষ করতেও আমোদ হত। একবার ধান হয়ে গেছে জমিতে। তখন জল পেয়ে জমিতে ঝরে পড়া ধানের বীজ লকলক সবুজ চারা হত। ধানের নাড়া থেকেও সবুজ পাতা বেরুত। মানুষের গরু, ছাগল তখন মাঠে ছাড়া হত। তারা যে সার দিত তাতে জমির উর্বরা শক্তি বাড়ত। এ ছাড়া খোল পচা, গোবর জল, চুন দেওয়া হত মাটির দোষ কাটাতে।

—পুরাতন বীজধান কোথাও পাওয়া যায় না আর?

একটু থামল বুড়ো। তারপর বলল, কোথা পাবে? আছে কি দুনিয়ায়? নেই? পৃথুরাজা নিজে ধান আবিষ্কার করেন। পৃথিবীমাতা একটা গাভীর রূপ ধরে ছুটছেন। পৃথুরাজা তির ধনুক নিয়ে তাঁকে তাড়া করেছেন রথে চেপে। গাভী নাগালের বাইরে চলে গেলে মানুষ না খেয়ে মরবে। সব ধান সেই গাভীর কাছে।

—তারপর?

—আর কী! এখন পাপে ভরে গেছে ধরিত্রী মাটি। মারপিট, অপরাধী মানুষ বাড়ছে। এতে কারও ভালো হয়? সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ধরিত্রী ধ্বংস হলে পৃথুরাজা আবার জন্ম নেবেন।

—তুমি আমার দাদুর সঙ্গে চাষ করতে তো?

—করতুম? বেঁচে থাকলে তোমার দাদু আমার বয়সিই হত বলতে গেলে। তোমার ঠাকুমার তো আশি পার হল বোধহয়।

—সঠিক হিসেব কেউ জানে না। ঠাকুমাও না।

—তোমার দাদু, ঠাকুরমশাই বড়ো ভালো লোক ছিল। রেতে যখন বাঁধ কাটতে যেতুম—জল বার করে না দিতে পারলে ধানগাছ মরে যাবে সব। তখন ওই আবছা রেতে ঠাকুরমশাই ডান হাতের বুড়ো আঙুলে পৈতা জড়িয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র বলত, আর মুঠো পাকিয়ে বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে বলত, যাঃ। অমনি সব ভূতপ্রেত অপদেবতা সব ঘুমিয়ে পড়ত। আমি টের পেতুম বাতাসে। বাতাসটা কেমন যেন শান্ত হয়ে আসত। ধানগাছ আনন্দে দুলত। রেতে এইভাবে আমরা কাজ করতুম।

—আর এখন?

—এখন আর অত গুণী মানুষ কই? তা চাড়া চারিদিকে আলো এসে গেছে; ভুতেরা সব তল্লাট ছেড়েছে। আমার এই উঠোনে ডাঁইড়ে রেত-বিরেতে বৃহৎ এক দুধসাদা লক্ষ্মীপ্যাঁচাকে উড়তে দেখি। বুঝি, মা এখনও আছেন।

—তবে এখন কারা ভাত রাঁধে?

—ভূতেরা।

—সেই ভাত খায় কারা?

—ভূতেরাই। সেই সব ভূত আমরাই তো! প্রতি অমাবস্যায় দেখবি আমরা কেমন উলটো গোড়ালিতে হাঁটি।

—হয় নাকি এমন। তুমি তো মানুষ।

—এককালে ছিলুম। আমার সময়ের মানুষ, গাছপালা, ফসল, পাড়া, মানুষের সরল মন —এসব কি আর আছে। আমরা তাই এখন ভূত। পুরনো সময়ের মানুষ?

—এ সময় তোমাদের নয়?

—না গো ঠাকুর! এটা তোমাদের সময়। তোমাদের এ দুনিয়াট দখলদারি আমরা করি নে।

—তাই কি এখনকার সব কিছুর সঙ্গে তোমরা মেলাতে পার না?

—কী জানি ঠাকুর! তবে এটুকুন জানি, আমাদের মতন পুরনো মানুষের মনে পুরনো হাওয়া বয়। পুরনো ধান্যচরিত কথা বলে।

—ধান্যচরিত জানো তুমিও?

—ওই যে বললুম, পুরনো খবর পুরনো মানুষের কাছে মিলবে। মুখে মুখে চলে আসছে সব। শুনো ঠাকুর? তবে শোনো—

হরহরি হইল ধান্য অতি সুনির্মল।
অর্ধ অঙ্গ কালো তার অর্ধেক ধবল।।

—তোমার কাছে এই হরহরি ধানবীজ-ই আছে। আমাকে বলেছেন আমার ঠাকুমা। —মিথ্যেটা বলতেই হল।

—তিনি তো জানবেনই। তবে হরহরি নয়, এ হল ঢেঁকিশাল ধান।

—সুগন্ধি ধান?

—বলতে পারো।

—ঠাকুমা এক মুঠো বীজ চেয়েছে। ওই চাল খাবে না, পরে চাষে এই বীজ চাষ করে খাবে।

—কিছু বীজ তোমায় দিতে হবে, এই তো?

—খুব উপকার হয় তাহলে?

বুড়ো তিনকড়ি অবশেষে রাজি হল। তার এক ছেলেকে মাঠগুদামে তুলে একটি জালা পেড়ে আনল। জালার গায়ে ঝুল-ময়লা। মুখে সরা বসানো। সরার ভেতর খড় পাকিয়ে রাখা। সেগুলি সরাতেই জালার মুখ থেকে ঝাঁক ঝাঁক ছোট্ট ছোট্ট ধানপোকা, রাতের মথের মতো, সাদা পাখা মেলে ঢেকে দিল তিনকড়ির আকাশ। তা দেখে পাগলের মতো আচরণ করতে থাকল তিনকড়ি। বাকি দুটি জালা পাড়িয়ে দেখা গেল একই জাতের পোকায় ছেয়ে ফেলল গোটা আকাশ আর ধানজমি। তিনকড়ি হা হা করে উঠল। জালা উলটে সব ধান ফেলে দিল উঠোনে। বলল,

—ওষুধ মাখানো ছিল, তাও রাখল না পোকায়! সব চিটে করে দিল! কবে হল!

সেই চিটেধান মুঠো নিল তিনকড়ি। থেবড়ে ভুঁয়ে বসে পড়ল। বিকৃত হয়ে গেল মুখ। আর কোনো কথা বলল না। শরীটা কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল তার। বুঝি, প্রাণের ভেতরের অব্যক্ত কথারা না-বেরুতে পেরে তোলপাড় করছে গোটা শরীর। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, কোনো প্রাচীন মানুষ—যে মাটি অর্থাৎ ধরিত্রীকে খুঁড়ে বের করে নিচ্ছে লুকিয়ে রাখা ধানবীজ। হয়তো তাই প্রতিটি সৎ চাষির মধ্যেই পৃথুরাজা অমর হয়ে বাস করেন।

বেশ কিছুক্ষণ সামলাতে সময় নিল তিনকড়ি। তারপর বলল—নাও ঠাকুর, চিটেই নিয়ে যাও না হয়।

আমি দ্বিধা করছিলাম। সেটা অনুভব করে বৃদ্ধ বললে,

—এই নিয়ে যাও। মাঠান এটি দেখলেও খুশি হবেন।

বোকার মতো বলি, —বীজধান কী হবে এতে?

—নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।

রুমালের যতকুলি ধরে, ভরে নিই চিটেধানে। বাড়ি গিয়ে ঠাকুমাকে বলতেই তড়বড় করে আঁচল পেতে ঠাকুমা বলে, —দে। এই আঁচলে ঢেলে দে। মা লক্ষ্মীকে আঁচলে গিঁট দিয়ে বাঁধতি না পারলে মা থাকনে না।

—ধান নয় ঠাকুমা, সুগন্ধি ধানের চিটে।

—চিটে ধান! ও তো ধানই। এই চিটের এক চিমটি রাখব মা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে। বাকিটা তুই মনসার জালায় আমাদের জমিতে গুড়ো করে ছইড়ে দিবি। তাতেই ধান ফলবে, তাতেই ফলবে।

—সেই সুগন্ধি ধান কে রাঁধে ঠাকুমা?

—কেন? মানুষ রাঁধবে!

—কে খায় তবে?

—কে আবার, মানুষ। আমরা সবাই মানুষ হই, ভূত নয় কেউ।

কী উচ্ছ্বাস ঠাকুমার! কী চঞ্চল প্রাণ! বেঁচে থাকার নতুন উপাদান যেন। যেন-বা হারিয়ে যাওয়া সন্তানের নতুন করে খোঁজ মিলল বহু বছর পর। সত্যি, কীভাবে যে ভালো হয়ে ওঠে মানুষের মন! নিজেকে ছাপিয়ে যে সোনা ঢালা, গলিত সোনার জ্যোৎস্নার ভেতর সাদা পাখি হয়ে উড়ে যায়!

বাঁধা আঁচলটা কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করল ঠাকুমা।

তারপর শুর করল নবান্নের গান!